স্থানীয় সরকার নির্বাচন ও গণতন্ত্র সুসংহতকরণ

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, 'সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক' (২২ নভেম্বর, ২০১০)

সম্প্রতি ঢাকা সিটি করপোরেশনের নির্বাচন সম্পর্কে আমাদের নির্বাচন কমিশন বিগ্রেডিয়ার (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন: 'ডিসিসির চ্যাপ্টার আপাতত ক্লোজড। এ নিয়ে আর কোন মন্তব্য করতে চাই না। ডিসিসি নিয়ে সরকারের রাজনৈতিক পরিকল্পনা থাকতে পারে। সরকারের অনীহাই ডিসিসি নির্বাচন হল না। আমরা স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানে সবসময় প্রস্তুত ছিলাম এখনও আছি' (যুগান্তর ৩ নভেম্বর, ২০১০)। সচেতন নাগরিক হিসেবে আমরা মাননীয় নির্বাচন কমিশনারের বক্তব্য পড়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, কারণ এর তাৎপর্য অত্যন্ত ভয়াবহ।

এ দেশের অসংখ্য গণতন্ত্রকামী নাগরিকের নিরবচ্ছিন্ন দাবির মুখে প্রায় দু'বছর সেনা সমর্থিত অনির্বাচিত সরকারের অবসান ঘটিয়ে গত ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত মহাজোট বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। নির্বাচনের পূর্বে ঘোষিত 'দিনবদলের সনদ' শীর্ষক নির্বাচনী ইশতেহারে আওয়ামী লীগ তার ২০২১ সালের জন্য প্রণীত রূপকল্পে সুস্পষ্টভাবে অঙ্গীকার করে: 'আমরা ২০২০-২১ সাল নাগাদ এমন এক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি যেখানে ... একটি প্রকৃত অংশীদারিত্বমূলক সহিষ্ণু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা (বিরাজ করবে), যেখানে নিশ্চিত হবে সামাজিক ন্যায়বিচার, নারীর অধিকার ও সুযোগের সমতা, আইনের শাসন, মানবাধিকার, সুশাসন, দূষণমুক্ত পরিবেশ। গড়ে উঠবে এক অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল উদার গণতান্ত্রিক কল্যাণরাষ্ট্র।' তাই বাংলাদেশে একটি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা আওয়ামী লীগের সুস্পষ্ট নির্বাচনী অঙ্গীকার।

এছাড়াও আমাদের সংবিধানের চারটি মূলনীতির অন্যতম হলো 'গণতন্ত্র'। উপরন্তু সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১১-তে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে, 'প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র ...।' বস্তুত বাংলাদেশ সৃষ্টির পেছনের মূল প্রেরণাই ছিল আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জন। তাই সংবিধান সমুন্নত রেখে আইনের শাসন কায়েম করতে হলে রাষ্ট্রে গণতন্ত্র কায়েম করা সকল সরকারেরই পবিত্র দায়িত্ব।

গণতন্ত্র হলো জনগণের সম্মতির শাসন। নির্বাচনের মাধ্যমেই নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ ও কল্যাণে কাজ করার জন্য তাদের সম্মতি অর্জন করে। সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে কেন্দ্রে সরকার গঠনের লক্ষ্যে সংসদ সদস্যগণ জনগণের সম্মতি অর্জন করে (যা একটি সীমিত ম্যান্ডেট)। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা শুধু কেন্দ্রীয় পর্যায়েই নয়, স্থানীয় পর্যায়েও প্রয়োগ করা হয়। তাই পরিপূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রশাসনের সকল স্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসন কায়েম করা আবশ্যক। অর্থাৎ সত্যিকারের গণতন্ত্র চর্চা মানে যেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ, সেখানেই আবশ্যক নির্বাচন ও জনগণের সম্মতির শাসন। তা না হলে গণতন্ত্রের নামে নাগরিকগণ হয় প্রতারিত। কারণ রাষ্ট্রের মালিক হিসেবে নাগরিকের রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার প্রধান হাতিয়ারই হলো তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ।

নির্বাচিত জাতীয় সংসদ গণতন্ত্রের উপরিকাঠামো এবং এ কাঠামোর পরিপূরক হলো নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ। বস্তুত নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির খুঁটিস্বরূপ, কারণ এগুলোর মাধ্যমে 'গ্রাসরুট ডেমোক্রেসি' বা তৃণমূলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তৃণমূলে গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে না উঠলে গণতন্ত্রের উপরিকাঠামো হিসেবে নির্বাচিত সংসদ ভীতহীন শূন্যে ঝুলন্ত ফানুসের রূপ নেয়। এ ধরনের জনঅংশগ্রহণহীন (আমাদের ক্ষেত্রে) কোটারি স্বার্থে পরিচালিত পদ্ধতি জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারে না এবং টিকেও থাকে না। কারণ এ ধরনের পদ্ধতিতে সংসদ সদস্যরা এখতিয়ার বহির্ভূত অনাকাঙ্ক্ষিত কার্যক্রমে জড়িত হয়ে যান এবং বেসামাল হয়ে পড়তে পারেন। আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতায়ই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাই তৃণমূলের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া একমাত্র নির্বাচিত সংসদকেন্দ্রিক কাঠামো সত্যিকারের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি কায়েমের পরিবর্তে এক ধরনের প্রহসনমূলক (illusive), অস্থিতিশীল পদ্ধতির জন্ম দেয়, যা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সুসংহত ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সর্বস্তরে কার্যকর গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমেই গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয়।

সৌভাগ্যবশত, আমাদের সংবিধানে পরিপূর্ণ ও সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েমের সুস্পষ্ট রূপরেখা দেওয়া রয়েছে। সংবিধানের ৫৯(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, 'আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।' অর্থাৎ সাংবিধানিক নির্দেশনানুযায়ী, আমাদের নির্বাচিত জেলা পরিষদ জেলা পর্যায়ে, নির্বাচিত উপজেলা পরিষদ উপজেলা পর্যায়ে, নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ ইউনিয়ন পর্যায়ে, নির্বাচিত সিটি করপোরেশনের প্রতিনিধিবৃন্দ সিটি করপোরেশনের ও নির্বাচিত পৌর পরিষদ পৌরসভার শাসনকার্য পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাদের প্রশাসনের সকল স্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসন এখনও কায়েম হয়নি কিংবা নির্বাচিত স্থানীয় সরকারকে (যেমন উপজেলা পরিষদকে) অকার্যকর করে রাখা হয়েছে। আবার অনেকক্ষেত্রে পরিষদের মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও, এগুলোর নির্বাচনের ব্যাপারে সরকার উদাসীন। তাই সংবিধানের বিধান উপেক্ষা করে আমাদের দেশে কখনও পরিপূর্ণ ও সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হয়নি এবং অতীতের সকল সরকারই এর জন্য সমভাবে দায়ী।

এ প্রসঙ্গে জেলা পরিষদের উদাহরণ টানা যেতে পারে। আমাদের ১৯৭২-এর সংবিধানে ৫৯ অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হলেও, স্বাধীন বাংলাদেশে জেলা পরিষদের নির্বাচন কখনও অনুষ্ঠিত হয়নি। (তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ১৯৭৫ সালে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদ বাতিল এবং পরবর্তীকালে ১৯৯১ সালে দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তা আবার পুনঃস্থাপিত হয়।) উল্লেখ্য, সংবিধানের ১৫২(১) অনুচ্ছেদে জেলাকে প্রশাসনিক একাংশ (administrative unit) বা স্তর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে – অন্যান্য প্রশাসনিক একাংশগুলো সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার আইন দ্বারা নির্ধারিত। তাই জেলা পরিষদের নির্বাচন এড়াতে হলে কিংবা জেলা পরিষদ ব্যবস্থা বাতিল করতে হলে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন হবে। তবুও অনেক জেলায়ই জেলা পরিষদের অবকাঠামো বিরাজ করলেও, এর জন্য প্রতি বাজেটে অর্থ বরাদ্দ থাকলেও এবং নির্বাচনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হলেও, নির্বাচনের মাধ্যমে জেলা পরিষদ কখনও গঠিত হয়নি – আর নির্বাচন না হলে পরিষদ গঠিত হয় না।

জেলা পরিষদের নির্বাচন না করে এবং অন্যান্য স্থানীয় সরকারসমূহের নির্বাচন সময় মতো না করে, শুধু সংবিধানই নয়, দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশও অমান্য করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদ বাতিলের মামলায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ ১৯৯২ সালে সর্বসম্মত রায় দেন যে, æThe existing local bodies are ... required to be brought in line with Article 59 by replacing the non-elected persons by election keeping in view the provision for special representation under Article 9. Necessary Action in the respect should be taken as soon as possible – in any case within a period not exceeding six months from date." [*Kudrat-E-Elahi Panir vs. Bangladesh* 44DLR(AD)(1992)] (সংবিধানের বিশেষ প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত ৯ অনুচ্ছেদের আলোকে নির্বাচনের মাধ্যমে

অনির্বাচিত ব্যক্তিদের পরিবর্তন করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে ৫৯ অনুচ্ছেদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে। এ বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ যথাশ্রীঘ্র নিতে হবে – তবে কোনো অবস্থায়ই যেন এ সময় এখন থেকে ছয় মাসের অধিক না হয়।) উল্লেখ্য যে, আদালতের রায় আইনের সমতুল্য।

প্রসঙ্গত, শুধু ঢাকা সিটি করপোরেশনেরই নয়, প্রায় অধিকাংশ পৌরসভা এবং সকল ইউনিয়ন পরিষদেরও মেয়াদ বহুদিন আগেই উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। বর্তমান সংসদ কর্তৃক প্রণীত *স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) আইন, ২০০৯*-এর ৩৪(ক) ধারা অনুযায়ী, 'এই আইনের অধীন কর্পোরেশন প্রথমবার গঠনের ক্ষেত্রে, এ আইন বলবৎ হইবার পার একশত আশি দিনের মধ্যে' সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।' আইনটি ১৫ অক্টোবর, ২০০৯ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। তাই বর্তমান সরকার ১৫ এপ্রিল ২০১০ তারিখের মধ্যে ঢাকা সিটি করপোরেশনের নির্বাচন না দিয়ে নিজেদের প্রণীত আইনেরও লঙ্ঘন করেছে।

প্রশাসনের সর্বস্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করা ছাড়াও, রাষ্ট্রে একটি ক্রিয়াশীল স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার আরও কয়েকটি আকর্ষণীয় দিক রয়েছে। একটি দিক হলো, এর মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়ন হয়। আমাদের সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। কিন্তু তৃণমূলের নির্বাচিত গণতান্ত্রিক কাঠামোর অনুপস্থিতিতে জনগণের সরাসরি ক্ষমতা প্রয়োগের এবং সরকার পরিচালনায় তাদের অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ থাকে না। তাই একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমেই প্রশাসনের সকল পর্যায়ে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত তথা অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। আর অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রের উন্নত সংস্করণ।

এছাড়া একটি শক্তিশালী ও কার্যকর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অপব্যবহারের সুযোগ বন্ধ করা যায়। যেমন, আমাদের সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব হলো 'আইনপ্রণয়ন' করা। আইনপ্রণয়ন বলতে সাধারণভাবে আইন পাশ, নীতি-নির্ধারণী ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংসদে বিতর্ক অনুষ্ঠান, সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর মাধ্যমে সরকারের স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং সরকারের বাজেট ও আর্থিক সিদ্ধান্ত অনুমোদন ইত্যাদিকে বুঝায়। অন্যদিকে সংবিধানের ৫৯(২) অনুচ্ছেদের বিধান মতে, নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব হলো জনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং 'পাবলিক সার্ভিস' বা জনকল্যাণমূলক সকল সরকারি সেবা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। কিন্তু নির্বাচিত জেলা পরিষদ এবং বহুদিন থেকে উপজেলা পরিষদের অনুপস্থিতিতে এবং সকল স্তরে নির্বাচন নিয়ে টালবাহানার কারণে আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্যগণ স্থানীয় সরকারের অনেক দায়িত্বই অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন, যদিও সবিধানের ৭(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সংবিধান যাদের যে দায়িত্ব দিয়েছে, তারা শুধু সে দায়িত্বই পালন করবে। এছাড়াও সংবিধানের ৫৯(২)(ক)-এর বিধান মতে, স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তাগণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে কাজ করার কথা, যদিও ঐতিহাসিকভাবে তারাই এসকল প্রতিষ্ঠানের ওপর খবরদারিত্ব করে আসছেন। এ ধরনের সংবিধান বহির্ভূত কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায়ে একটি চরম দ্বন্দ্বাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, যা বর্তমানে স্থানীয় উন্নয়নে ব্যাপক স্থবিরতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সৃষ্টির পেছনে আরেকটি যৌক্তিকতা হলো সরকারি সেবার ক্ষেত্রে জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতি 'রেসপনসিভনেস' বা শ্রদ্ধাশীলতা এবং মানসম্মত সেবা প্রদান। কিন্তু স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে আমলাতন্ত্র ও সংসদ সদস্যদের নিয়ন্ত্রণে এবং অকার্যকর রেখে এ লক্ষ্য অর্জন কোনোভাবেই সম্ভবপর নয়।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার অন্য একটি যৌক্তিকতা হলো, এর মাধ্যমে সরকারি ক্ষমতা প্রয়োগকারীদের জনগণের কাছে সরাসরি জবাবদিহি করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের জনগণের মুখোমুখি করার বিধান করে তা কার্যকর করা যেতে পারে, যা কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বা প্রশাসনের উপরের স্তরে করা সম্ভবপর নয়। বস্তুত জনপ্রতিনিধিদের স্বচ্ছ ও জবাবদিহি করার একটি আন্দোলন তৃণমূল পর্যায় থেকেই শুরু হতে পারে। প্রসঙ্গত, এ লক্ষ্যে *স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইনে ২০০৯*-এ 'ওয়ার্ডসভা'র বিধান রাখা হয়েছে। এ বিধানের ফলে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগন বছরে অন্তত দু'বার ভোটারদের মুখোমুখি হতে বাধ্য হবেন, যদিও এ ব্যবস্থা এখনও কার্যকর হয়নি।

প্রসঙ্গত, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হলে 'সাবসিডিয়ারিটি' তত্ত্বের প্রয়োগ আবশ্যক। সাবসিডিয়ারি তত্ত্বের মূলকথা হলো সমস্যা যেখানে, সমাধানও সেখানে। অধিকাংশ সমস্যাই তৃনমূলের, যেখানে জনগণ বসবাস করে, তাই সমস্যাগুলো (যেমন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পয়ঃনিস্কাশন ইত্যাদি) প্রথমেই সর্বাধিক নিম্নস্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (যেমন, ইউনিয়ন পরিষদের) মাধ্যমে সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো উচিত। যে সকল সমস্যা সর্বাধিক নিম্নস্তরে সমাধান সম্ভব নয়, সেগুলো তার উপরের স্তরে সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া উচিত। পরের সমস্যাগুলো তার পরবর্তী স্তরে ... । এ পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব হয়ে পড়ে অত্যন্ত সীমিত। আর এটিই সত্যিকারের গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের (democratic decentralization) পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব হবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথাযথ 'ফাংশনস' বা দায়দায়িত্ব, 'ফ্রীডম' বা স্বাধীনতা, 'ফাইন্যান্স' বা সম্পদ এবং 'ফাংশনারিজ' বা জনবল প্রদান – 'ফোর এফ' (four F) প্রদান – তাদের নিয়ন্ত্রণ নয়।

পরিশেষে, এটি সুস্পষ্ট যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রশাসনের বিভিন্ন একাংশ বা স্তরে (যেমন, জেলা, উপজেলা ইত্যাদি) প্রয়োগ করা হয় এবং এসকল স্তরে জনপ্রতিনিধিদের শাসন প্রতিষ্ঠাই গণতান্ত্রিক শাসনের মূলকথা। তাই গণতন্ত্র সুসংহত এবং সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠানিক ভীতের ওপর দাঁড় করাতে হলে প্রশাসনের সকল স্তরে নিয়মিত ও যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গঠন এবং এসকল প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করার কোনো বিকল্প নেই। বস্তুত নির্বাচিত স্থানীয় সরকার ছাড়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই পরিপূর্ণতা লাভ করে না এবং সংসদভিত্তিক গণতান্ত্রিক উপরিকাঠামোর জন্য ভীত বা খুঁটির সৃষ্টি হয় না। আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা থেকেই দেখা যায় যে, সকল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানহীন বা খুঁটিহীন গণতন্ত্র স্থায়িত্ব লাভ করে না। তা সত্ত্বেও সংবিধান অমান্য করে, আদালতের নির্দেশ উপেক্ষা করে এবং সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান লঙ্ঘন করে একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে বাংলাদেশে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েমের ক্ষেত্রে আমাদের সরকারগুলো একের পর এক ব্যর্থ হয়েছে। অর্থাৎ, আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলে ক্ষমতায় আসলেও, স্থানীয় সরকারের নির্বাচন না করে জনগণের সাথে এক ধরনের প্রহসনে লিপ্ত হয়েছে, যে প্রহসনের পরিণতি অমঙ্গলকর হতে বাধ্য।

উল্লেখ্য, শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব, যা জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য অপরিহার্য। আর সাবসিডিয়ারিটি তত্ত্ব কাজে লাগানোর মাধ্যমেই বিকেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা কায়েম হয়। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে ক্ষমতা, দায়-দায়িত্ব ও সম্পদ জনগনের যত কাছের সরকারের কাছ হস্তান্তরিত হয়, তত বেশি তাতে স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং তা জনগণের অধিক কল্যাণে আসে। তাই জনকল্যাণে এবং গণতন্ত্র সুসংহতকরণে নিবেদিত আমাদের নির্বাচিত সরকারগুলো কেন স্থানীয় সরকারের নির্বাচনে অনাগ্রহী তা আমাদের কাছে বোধগম্য নয়! না-কি জনকল্যাণ ও গণতন্ত্র তাদের জন্য কেবলই স্লোগান মাত্র? #